গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও মানবসম্পদ গঠনের হালহকিকত

মানুষ আছে বলেই দেশ। মানুষের জন্য দেশ। মানুষই মানুষের জন্য দেশ গড়ে। মানুষই সর্বেসর্বা। আমি বলি উন্নয়ন মানে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠির মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ততা। উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী উন্নত সমাজ গড়বে, দেশ গড়বে। মানসিকতার এই উন্নতি ঘটাতে পারে একমাত্র সুশিক্ষা, উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। সুশিক্ষা উন্নত সমাজ গড়ার জন্য মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আবার শিক্ষা মানেও শুধু লেখা, পড়া ও অঙ্ক জানাকে বোঝাবে না। এ তিনটি ছাড়াও শিক্ষায় মনের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুসন্ধানী মনোভাব ও সৃষ্টিশীলতা, মানবিকতা, সততা, জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ, দেশপ্রেম এবং ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণগুলো জেগে উঠতে হবে। এই গুণগুলোর সূচক যত উপরের দিকে যাবে, সে জনগোষ্ঠী তত শিক্ষিত হবে। আমার দৃষ্টিতে দেশের উন্নয়ন মানে দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন। মানব-সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। মানব-সম্পদকে অনুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। যদি মানব-সম্পদকে মানব-আপদ বানিয়ে উন্নয়নের চেষ্টা করাও হয়, সে উন্নয়ন দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দুঃশাসন ও দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে ভরা- তা আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়ন দেখা গেলেও সে উন্নয়ন সাময়িক, হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো, ফু দিয়ে ফোলানো বেলুনের মতো- সকাল হতে না হতেই চুপসে যায়, টেকসই উন্নয়ন হয় না। সেজন্য আমাদের সবারই দূরদর্শী লেন্সওয়ালা চশমা কেনা দরকার। যে কথার কোনো বিকল্প নেই, তা হলো- দেশকে উন্নত করতে গেলে, দেশটা ভালোভাবে চলতে গেলে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সৎ, নীতিবান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দেশাত্ববেধে উজ্জীবিত জনসম্পদ (জন-আপদ নয়) সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পদে কর্মরত থাকতে হবে। কোনো একক ব্যক্তি- সে যত সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত, সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া, সমৃদ্ধ জাতি, উন্নত সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে পারে না।

উন্নত দেশ ও সমৃদ্ধ জাতি গড়তে হলে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার উন্নয়ন দরকার। আমাদের জনগোষ্ঠীর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আছে কি? বাস্তবতা হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষার উন্নয়নে আমরা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশই দিতে পারছিনে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বই থেকে শেখায় এক কথা, বাইরের পরিবেশ থেকে শেখে উল্টোটা। খেলাপাগল অবুঝ বাচ্চারা জীবনের উন্নতির কিই-বা এমন বোঝে! একটুতে একটু হলেই কুঁড়িতে ঝরে যায়। উঠতি বয়সে বিপথে যায়। ভবিষ্যতে নিজেই যখন নিজের অপারগতার কথা বোঝে, তখন আর ফেরার পথ থাকে না। এভাবে পর পর তিনটা পুরুষ আত্মসচেতনতার অভাবে লেখাপড়া হয়নি আবার মাঝখান থেকে ষাট বছর পেরিয়ে গেছে- এমন অনেক পরিবারকেই আমি দেখেছি। এ জন্যই স্বাক্ষরতার হার এদেশে তেমন একটা বাড়ছে না। জোড়া-তালি দিয়ে খাতা-কলমে যা দেখানো হচ্ছে তার মধ্যেও অতিরঞ্জিত আছে বলে জানি। আবার স্বাক্ষরতার হার একটু বাড়লেও শিক্ষার হার নিম্নমুখী। এভাবে শিক্ষার হারকে স্বাক্ষরতার হার দিয়ে আর কতদিন চলবে! মূলত কলম কাঁপাতে কাঁপাতে নামের বানানটা কোনোভাবে এলোমেলো বসাতে পারলেই তাকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাতারে নাম না লেখানোই ভালো। আমরা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যকে জীবন পরিচালনার জন্য শিক্ষা না ভেবে চাকরি পাওয়ার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছি। অথচ চাকরি পেতে লেখাপড়ার সাথে প্রয়োজনীয় সফ্ট স্কিলস না শিখে শুধু সাধারণ লেখাপড়া শিখে চাকরির বাজারে ভিড় জমায়। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ে।

দরকার, কারো প্রকৃতি-প্রদত্ত অবস্থান থেকে শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রয়োগের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তার উৎকর্ষ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই মানসিকতার ও চিন্তা-চেতনার উন্নতির নামই শিক্ষা। উন্নত সমাজ গঠনে এই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। লেখাপড়া দিয়ে শিক্ষা অর্জনের সূচনা। শিক্ষা মানে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার জন্য জীবনের প্রথম থেকেই একটা সাধারণ প্রস্তুতি। সেজন্যই জীবন শেষে অবসর জীবনে শিক্ষা না দিয়ে জীবনের শুরুতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা জীবনভর থাকা দরকার। দেশে যদি প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি না করা যায়, তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মুখসর্বস্ব বিজ্ঞাপিত উন্নয়ন কোনো দিনই টেকসই উন্নয়ন হয় না। তা অল্প সময়ের ব্যবধানে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

এবার বেশ কিছুদিন পর গ্রামে গেলাম। করোনার কারণে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে স্কুল খুলেছে। ইচ্ছে করেই বেশ কয়েকটা প্রাইমারি স্কুলে গেলাম। প্রায় প্রতি গ্রামেই সরকারি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। যত গোল পাকালো এই 'সরকারি' (ব্যতিক্রম বাদে, ব্যতিক্রম তো কোনো ক্রম নয়) শব্দটা নিয়ে। সরকারি সেবা, দিতে চায়ই-বা কে-বা! শিক্ষকগুলো তো সরকারি লোক হয়ে যায়। কাজ ও বেতনের চিন্তামুক্ত নিরাপত্তা পায়। দায়িত্বও সরকারি দায়িত্ব। 'সরকারি মাল, দরিয়ামে ঢাল' দেখা দেয়। এসবও শিক্ষা ও দায়িত্ববোধের অভাব। সেজন্য সবাই সরকারি ও এমপিও-ভুক্তির খাতায় নিজের নামটা যে-ভাবেই হোক লেখাতে চায়। দায়িত্ববোধের কোনো বালাই নেই, কর্মোদ্যম নেই, শুধু বসে বসে সময় পার করার চেষ্টা। সময়ের অনিবার স্রোতে জীবন ও কর্মকে নগণ্য করে কাগজের নৌকার মতো ভাসিয়ে দেওয়া। এটা এ দেশের প্রতিষ্ঠিত হাবভাব, নিয়ম, সংস্কৃতি। এই সরকারি মনোভাব ও অবস্থার স্রোতে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই নিশ্চেষ্ট মনোভাবের ধাক্কা স্কুলগুলো ও ছাত্রছাত্রীরা সামলাচ্ছে। শিক্ষকদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। জেলা-উপজেলার কর্মকর্তারা কখনো-সখনো স্কুল ও শিক্ষকদের দেখতে আসেন। শিক্ষার অবস্থা তো আর দেখতে আসেন না। শিক্ষক ও কর্মকর্তার চাকরি অব্যাহত থাকে। এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলছে। এভাবে চলে চলে গা সওয়া হয়ে গেছে। অনিয়মই নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে, সমাজে একবার যদি কোনো একটা অনিয়ম চলে আসে, সেটাকে সাথে সাথে মূলোৎপাটন না করতে পারলে সেটা আরো ডালপালা মেলে ক্রমশই প্রসার লাভ করে। অনিয়মের মূল বৃহত্তর সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসা অতটা সহজ হয় না। দেখলাম, পঞ্চম শ্রেণির খুব কম ছাত্রছাত্রীই উচ্চারণ করে বাংলা বইটা পড়তে পারে। যোগ বিয়োগ জানে না। হাতে গুনে যে ক'জন জানে, তা জানে তাদের সচেতন বাপ-মায়ের কারণে। বাপ-মাদের বাড়িতে নিজে অথবা আলাদা টিউটর রেখে ছেলেমেয়েকে পড়ার তালিম দিতে হয়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা শুধু আসে এবং যায়। পরীক্ষা দিতে হলে স্কুলে আসতে হয়। উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য আসতে হয়। অভিভাবকমহলের অনেকেই অসচেতন, অজ্ঞ। উপবৃত্তির টাকা হাতে পেয়েই খুব খুশি। শুধু নগদটাই বোঝে, ভবিষ্যৎটাকে একেবারেই বুঝতে চায় না। ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে যে পাঁচটা মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে গেল অথবা পঞ্চম শ্রেণি শেষেই ঝরে গেল- সে ভাবনা বেখবর। তাদের নিদেন বুঝ, 'স্কুলে গেলে মাসে মাসে উপবৃত্তির টাকাটা তো পাওয়া যাচ্ছে। এটাই-বা মন্দ কি!'

প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি হাই স্কুলের খোঁজ-খবরও ভালোমতো নিলাম। আশপাশ যত হাই স্কুল আছে একই অবস্থা। তারপর বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির আগেই ঝরে যাচ্ছে। আবার হাইস্কুলে গেলেও সেখানে কোনো শিক্ষা নেই। লেখাপড়ার জন্য বাসায় টিউটর। স্কুলে যাওয়া আসা মানে স্কুলের খাতায় নাম

লিখিয়ে রাখা, লেখাপড়ায় বহাল থাকা। সময়ান্তে সার্টিফিকেট পাওয়ার বন্দোবস্ত। লেখাপড়ার মানও খুব নিম্ন। চিন্তাভাবনা ও চেতনার উন্মেষ নেই। মানবতা, সততা, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ শিক্ষা নেই। না আছে ভাষা জ্ঞান, ভাবুক মন, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। যারা উচ্চশিক্ষায় যাচ্ছে, তাদেরও গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে। দিন পার হয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়ায় বইয়ের পড়ার সাথে বাস্তব ঘটনাকে মেলাতে শেখে না। লেখাপড়া মনে চিন্তার উদ্রেক করে না, ভাবনা আসে না। মনের মধ্যে কোনো সৃষ্টিশীলতা জন্মায় না। টেক্সট বইও না, শুধু নোট মুখস্ত করার কর্ম। কোনো ভাষা জ্ঞান নেই, ভাষার উপর দখল নেই। জীবনের জন্য শিক্ষা নেই, সমাজের জন্য উপযুক্ত মানুষ হবার শিক্ষা নেই, কর্মমুখী শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যশিক্ষা নেই, নৈতিকতা-শিক্ষা নেই। অথচ নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্কুলের কেরানি মহাশয় প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষা-রিপোর্ট শিক্ষা বিভাগে যত্ন সহকারে পাঠাচ্ছেন। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে কেউ-না-কেউ বক্তৃতার ঝড় তুলছেন। পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

আমরা যেহেতু স্বাক্ষরতার হার বাড়ানো নিয়েই বড় বড় বক্তৃতা দিতে থাকি, তা হচ্ছে। এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ কুসুম কলি যে প্রস্ফুটিত না হয়ে প্রতিনিয়ত কুড়িতেই ঝরে যাচ্ছে, দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে, জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে– এ নিয়ে কারো কোনো উচ্চবাচ্য নেই। শিক্ষকেরাও চুপচাপ, বেতন নিয়েই তৃপ্ত বোধ করছেন। স্কুল কমিটিরও কোনো টু-শব্দটা নেই; সবাই রাজনীতি নিয়ে ও যার যার ধান্দায় মহাব্যস্ত। এমন করে বিশাল একটা অবুঝ জনগোষ্ঠীর জীবনকে আমরা অঙ্কুরেই ধংস করে দিচ্ছি। আবার জনসম্পদ ধংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে উন্নয়নের জিকির পাড়ছি। কখনো হা-হুতাশ করছি, কখনো বিকারগ্রস্ত লোকের মতো প্রলাপ বকছি। দেশের উন্নয়নের কথা বাদ দিলেও যে অগনিত মানবসন্তান জীবনযুদ্ধে শুরুতেই হেরে গেল, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলো, তারা এই অন্ধকার মানবেতর জীবন কাটানোর জন্যই হয়তো পৃথিবীতে জন্মেছিল, এ কথাই মেনে নিতে হয়। নইলে তাদের এই হতচেতন বঞ্চনাভরা জন্মের স্বার্থকতা কোথায়?

আর্থ-সামাজিক গবেষণার কাজে বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ সমাজে গেছি, প্রতিটি পরিবারকে কাছ থেকে পরখ করে দেখেছি। হয়তো দাদা লেখাপড়া করেনি, আবার তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর সময় আসতে কমপক্ষে পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। নাতি-নাতনী ও তাদের অভিভাবক যদি আবার লেখাপড়া উদাসী হয়, তাদেরও লেখাপড়া হয় না। তাদের পরবর্তী পুরুষ আসতে আবারো পঁচিশ বছর পেরিয়ে যায়। তাই দাদা থেকে নাতি পর্যন্ত বা তার ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত ষাট পছর পেরিয়ে যায় নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে। এভাবেই কিন্তু এদেশের শিক্ষা বংশ-পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর পর্যন্ত অধরা রয়ে যাচ্ছে। পরিবারের কেউ কেউ কপালগুণে লেখাপড়া শিখে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। অনেকেই প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই ঝরে যাচ্ছে। আর লেখাপড়া তো শুধু স্কুলে আসা-যাওয়া করলেই হয় না। বাপ-মার আগ্রহ ও সচেতনতা এবং উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

এমনই একটা পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধ রহমতুল্লাহ। লেখাপড়া জানেন না। রহমতুল্লাহর মৃত্যু-পালে বাতাস লেগেছে, এদেশের স্বাধীনতার জন্ম অর্ধশতবার্ষিকী ধুমধামের সাথে পালিতও হয়েছে; কিন্তু তার মুমুক্ষু ওয়ারিশগণের আত্মোন্নয়ন ও শিক্ষা-দীক্ষার তেমন কোনো পরিবর্তন আমি লক্ষ করিনি। অজ্ঞতা এদের জীবনসঙ্গী। এরা জীবনের অর্থ বোঝেনি। এরা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা কায়িক শ্রম দিয়ে শুধু দু'বেলা পেটের ভাত যোগাড় করাটাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ঠাওর করেছে। আর হালনাগাদ জরাগ্রস্ত-নষ্ট-দিকভ্রষ্ট দেশীয় রাজনীতির বিষবাষ্পে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিনীত-রাজনৈতিক শক্তির সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত

হয়েছে। এভাবেই মগডালের সুখপাখিকে আকড়ে ধরার সুখদ স্বপ্ন দেখেছে। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সীমিত চিন্তার গন্ডিতে আবদ্ধ থেকেছে কিংবা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টা করেনি বা চেষ্টার চিন্তাই মাথায় আসেনি বা পরিবেশ তাকে বঞ্চিত করেছে। ভাগ্যকে দোষারোপ করে প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে।

বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের মাধ্যমে, পেপার-পত্রিকা পড়ে সারা দেশের গ্রামবাংলার শিক্ষা, শিক্ষার দশা ও সামাজিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়েছি ও জেনেছি। সব জায়গার অবস্থা কমবেশি একই রকম।

রহমতুল্লাহর চিন্তা-ভাবনার পরিণতি ভাবলে আমার কষ্ট হয়। তিনি নিজে বোঝেন না সত্য, কিন্তু সমাজের কেউ না কেউ যদি তাকে শিক্ষার সুফল ও উন্নত জীবনব্যবস্থা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলে ছেলে-মেয়েগুলোকে অন্তত লেখাপড়া শেখানোর জন্য পথ দেখাতো, শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে নিয়মিত কাউন্সিলিং করতো, নিয়মিত জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দিতো, স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো, তাহলে তাকে কিংবা তার বংশধরদেরকে এভাবে বংশ পরম্পরায় নিরক্ষর, অজ্ঞ বা অশিক্ষিত থাকতে হতো না। এদেশের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব কী? তারা তাদের মূল দায়িত্ব থেকে যোজন যোজন দূরে সরে চলে গেছে। আমরা উন্নয়নের রূপরেখা গড়তে ব্যক্তিকে (ব্যষ্টিক) টার্গেট করে কাজে নামছিনে কেন? ব্যষ্টিক উন্নয়নের যোগফলই তো সামষ্টিক উন্নয়ন। তাহলে দেশও রহমত গংকে নিয়ে অনেক আগেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেত। এই একটা বংশ পরম্পরার মধ্যেই এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেক ভাবনা-চিন্তা, মনোবিজ্ঞান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রূপরেখা, জীবন দর্শন, বঞ্চনা ও কালের কথা লুকিয়ে আছে।

(১৩ সেপ্টেম্বর '২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।